সারসংক্ষেপ

৭ ই এপ্রিল,২০১৬,সন্ধ্যায় নামাজ শেষ হবার সাথে সাথে, সাদিয়া,২৭, নিচে রাস্তায় নেমে আসার জন্যে তার স্বামীর ডাক শুনতে পাচ্ছিলো। তিনি যখন দরজার কাছে পৌঁছেছিলেন, তখনই, দুজন লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার পথ অবরুদ্ধ করে ফেলে। তার স্বামীর নির্দেশে,তার সহযোগীরা তাকে তখন নাইট্রিক এসিড নিক্ষেপ করে। "আমার স্বামী দাঁড়িয়ে দেখছিল যখন আমার গায়ের কাপড় খুলে নিচে পড়ে যায় এবং আমার গলার গয়না এবং কানের দুল গলে গলে আমার চামড়ার সাথে মিশে যাচ্ছিল," সাদিয়া বলেছিলেন। চারটি অস্ত্রোপচারের পর এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় চার মাস থাকার পর সাদিয়া তার বাম কান এবং বাম চোখ হারিয়ে ফেলে। "সে (সাদিয়ার স্বামী) আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল," এক বছর পরে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার সাথে দেখা করলে তিনি এ কথা বলেছিলেন।

বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের লক্ষ্য করে এসিড সহিংসতা একটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার চরম পর্যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাত্কার দেওয়া নারীদের অনেকেই কয়েক মাস বা কয়েক বছর ধরে মারধর এবং অন্যান্য শারীরিক আক্রমণ, মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতন, এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণসহ পারিবারিক সহিংসতা সহ্য করেছেন যা পরে এসিড আক্রমণের দিকে গিয়ে শেষ হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাদিয়ার ১২ বছরের বিবাহিত সময়ে, এসিড আক্রমণের আগে, তার স্বামী তাকে নিয়মিত মারধর করত এবং তিন বার তার চোখে রাসায়নিক ঢেলে দেয়, প্রতিবার যা তাকে অস্থায়ীভাবে অন্ধ করে দেয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর ২০১৫ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিবাহিত ৭০ শতাংশের বেশি নারী বা মেয়েরা তাদের অন্তরঙ্গ পার্টনারের (স্বামী) দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন; এবং যার প্রায় অর্ধেক নারীরা বলেন যে তাদের পার্টনাররা তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে) বলেছে, ২০১৯ সালে কমপক্ষে ২৭০ জন নারী বা মেয়েকে তাদের স্বামী অথবা স্বামীর পরিবার হত্যা করেছিল। বাংলাদেশর আরেকটি উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের মতে, জানুয়ারী ২০০১-ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে, যৌতুক বিরোধ নিয়ে ৩,৩০০ এরও বেশি নারী ও মেয়েকে হত্যা করা হয়েছিল। যদিও এই সংখ্যাগুলো মিডিয়া প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে, তবে সম্ভবত এগুলো সহিংসতার সঠিক সংখ্যার শুধুমাত্র একটা অংশ মাত্র।

কোভিড -১৯ মহামারীতে সরকার ও এনজিও হটলাইনের কলের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আরও বেড়েছে বলে ধারনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের একটি বৃহত্তর বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইনি সেবা কার্যক্রম গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০২০ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার ঘটনাবলিতে প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার এই সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও, সরকারের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট অপ্রতুল এবং লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবেদন বা আইনি পথ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাগুলি প্রায়শই দুর্গম।

সাদিয়া বলেছেন যে ১২ বছরের বিবাহিত সময়ে তার স্বামী তার প্রতি যে সহিংস আচরণ করেছে, সে কারনে তিনি কখনই পুলিশকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানাতে আস্থা পাননি এবং আশঙ্কা করেছিলেন যে এটি কেবল তার স্বামীকেই ক্ষিপ্ত করবে এবং যেহেতু তার কোন সমর্থন নেই তাই এটি তাকে আরও ঝুঁকিতে ফেলবে।

পুলিশের ওপর আস্থার এই অভাবটি দুঃখজনকভাবে প্রচলিত এবং এই বিষয়টির সাথে আরও জোরালো যে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা সামাজিকভাবে এতটাই স্বাভাবিক হিসেবে ধারনা করা হয় যে বেঁচে যাওয়া নারীরা প্রায়শই তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে গুরুত্বের সাথে নেয়ার মত বা রিপোর্ট করার মতো মনে করেন না। তার স্বামী তাকে এসিড পান করতে বাধ্য করার পরে তিনি পুলিশ রিপোর্ট করতে চেয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে, ১৯ বছর বয়সী জয়া বলেন, তার বাবা তাকে বলেছিলেন "পরে।" "অভিযোগ করে কি হবে?" ২০১৫ সালের বিবিএসের একই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অর্ধ শতাধিক বিবাহিত নারী এবং মেয়েরা এমন কিছু নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে যে ৭০ শতাংশেরও বেশি বেঁচে থাকা নারীরা কখনও এসব কথা কাউকে বলেননি, এবং মাত্র তিন শতাংশেরও কম নারীরা এই বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ নিয়েছিল। একজন নারী অধিকার আইনজীবীর মতেঃ "সমাজ পারিবারিক সহিংসতাকে ছোটখাটো সহিংসতা বলে মনে করে, এটা এমন যে এ ধরনের ঘটনা পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে।"

৫০ টি সাক্ষাত্কারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতায় দোষীদের দায়বদ্ধ করা এবং বেঁচে থাকা নারীদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাগুলোর কথা উল্লেখ করেছে। আইনের শরণাপন্ন হওয়া এবং সুরক্ষা অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগত সমস্যাগুলি বুঝতে আমরা এসিড আক্রমণের শিকার হওয়া ২৯ জন নারী এবং মেয়েদের ওপর গবেষনা করি।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে, এসিড সহিংসতা মোকাবেলায় সরকারের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কার্যকরভাবে সমন্বিত নাগরিক সমাজের প্রচারণার পাশাপাশি শক্তিশালী আইন পাস করার পরে, এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এসিড আক্রমণগুলি ২০০২ সালে ৫০০ টি ঘটনা থেকে নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালের ১৭ টি হামলায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

একজন আইনজীবী ব্যাখ্যা করেছেন যে, অনেক কিছুর মধ্যে এসিডের মামলাগুলি সক্রিয়, সুসংহত, নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং সরকার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কারনে বেঁচে যাওয়া নারীদের পক্ষে ন্যায়বিচার এবং সমর্থন পাওয়া সবচেয়ে "সহজ" হয়েছে। তবে এই সকল মামলাতেও, আইনী সহায়তা গ্রহণ করা সহজ নয়।

এই ত্রুটিটি কেবলমাত্র এসিড সহিংসতাতেই নয়, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাকে আরও বিস্তৃতভাবে মোকাবেলার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার সবচেয়ে স্পষ্টতর ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে: যা ন্যায়বিচার সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশাল বাঁধা। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির একজন আইনজীবী বলেছিলেন: "লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা।"

এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে বেঁচে থাকা নারী ও মেয়েরা কেবল ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় ব্যর্থ হচ্ছেন না, বরং অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া ও সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিষেবা পেতে ব্যর্থ যার কারনে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের বিচার গুরুতরভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়।

আইন প্রয়োগের দুর্বলতা

বাংলাদেশ নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা নিরসনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০০০ সালে, ডেনিশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, বাংলাদেশ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত বহু-সেক্টরাল কর্মসূচির (এমএসপিভিএডাব্লু) উদ্বোধন করেছে এবং নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে

সহিংসতা রোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। নারী ও শিশুদের উপর বৈষম্যমূলক প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিস্তৃত সহিংসতা মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ল্যান্ডমার্ক আইনটি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে একই নাম অনুসারে বাংলাদেশ নারী-ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (Women and Children Repression Prevention Act) ২০০০ কার্যকর করেছে।

২০০২ সালে এসিড আক্রমণের ঘটনা যখন প্রায় ৫০০ টির উপরে - যার বেশিরভাগই নারী ও মেয়েদের উপর ঘটে গিয়েছিল - নারী অধিকার সংস্থা, বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা জনসাধারণের চাপ এবং সুসংহত তৎপরতা সরকারকে দুটি আইন কার্যকর করতে বাধ্য করেছিল: এসিড অপরাধ প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (The Acid Offense Prevention Act, 2002) এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (The Acid Control Act, 2002)

২০১০ সালে, বাংলাদেশ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন (Domestic Violence (Prevention and Protection) Act) (ডিভিপিপি আইন বা DVPP Act) পাশ করে, যা যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতার বাইরে পারিবারিক সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। এখানে শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনটি ভুক্তভুগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা দেয় এবং সুরক্ষা আদেশের লঙ্ঘনকে অপরাধী করে তোলে

যদিও, বাংলাদেশ নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০, ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং ডিভিপিপি আইনের দশ বছরের বার্ষিকী হিসাবে, এটি স্পষ্ট যে এই পরিকল্পনা এবং আইনগুলির বাস্তবায়ন মারাত্মকভাবে কম। দেশের অন্যতম প্রাচীনতম মহিলাদের অধিকার সংগঠন নারীপক্ষের একজন আইনজীবী ব্যাখ্যা করেছেন, "জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় এমন অনেক সুন্দর বিষয় আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনি যখন মাঠের দিকে তাকাবেন, তখন তার বাস্তবায়ন দেখবেন না।"

কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কোভিড -19 মহামারীতে বাংলাদেশে নারী ও কন্যা শিশুদের প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। বাংলাদেশের একটি বৃহত্তম বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইনি সেবা কার্যক্রম গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০২০ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনাবলিতে প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ করেছে। এপ্রিলে স্ত্রীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার সময় এক ব্যক্তি ফেসবুকে লাইভ এ তা সম্প্রচার করে। মে মাসে, একজন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে ইট দিয়ে মাথার উপরে আঘাত করে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেন, কারণ তিনি ইফতারের সময় ফ্রিজ থেকে পানি এনে দেননি। একই সময়ে, আইনী সহায়তা এবং জরুরি সুরক্ষা ব্যবস্থার অভিগম্যতা কমিয়ে এনেছে, যা ইতিমধ্যে ব্যর্থ হওয়া ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে।

২০২০ সালের ২৬শে মার্চ, সরকার দেশব্যাপী "সাধারণ ছুটি" ঘোষণা করে –মূলত কোভিড -১৯ এর বিস্তার বন্ধ করার জন্য একটি দেশব্যাপী লকডাউন — যা ২০২০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত পরবর্তীতে বাড়ানো হয়। এই লকডাউনের শেষের দিকে ২,১৭৪ জন নারীর ওপর সমীক্ষা চালানো হয়, যা আগস্টে দ্য ল্যানসেটে প্রকাশিত হয়, সেখানে দেখা গেছে যে এই সময়ে নারীরা বেশি যৌন ও শারীরিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, যারা শারীরিক সহিংসতার কথা জানিয়েছেন, তাদের অর্ধেকেরও বেশি যাদের থাপ্পড় মারা হয়েছিল বা তাদের উপর কিছু ছুঁড়ে মারা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিল, তারা বলেছেন যে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে এই সহিংসতা বেড়েছে। কারও কারও কাছে এই পারিবারিক সহিংসতা

ছিল নতুন। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এপ্রিল মাসে ১৭,২০৩ জন নারী ও শিশুদের ওপর জরিপ করে ছিল এবং দেখা গেছে যে ওই মাসে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার অভিযোগপ্রাপ্ত ৪,৭০৫ জন নারী ও শিশুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বলেছিলেন এটি প্রথমবারের মতো।

এমনকি মহামারী চলাকালীন নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে খুব বেশী মাত্রায় সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, সরকারি নীতিগুলি বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্য জরুরি সহায়তা প্রদান এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বন্ধ থাকা অস্থায়ীভাবে আদালত পরিষেবার মাধ্যমে আইনি প্রতিকারের সুযোগ দেয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে সীমিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং থানা থেকে বেঁচে থাকা নারীদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ব্র্যাক এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তাদের হটলাইনে ফোন করা বেশিরভাগ কলকারীরা বলেছিলেন যে তারা আটকা পড়েছেন, এবং ঘরে বসে সহিংসতা থেকে বাঁচতে পারছেন না কারণ তারা লকডাউনের সময় কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে পারেননি এবং বিকল্প হিসাবে কোন সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রও নেই। একটি উদাহরণসরূপ, ব্লাস্ট একটি কেস নথিভুক্ত করে যেখানে এক নারী ২০২০ সালের ২৫শে এপ্রিল তার বাসা ছেড়ে চলে যায়, কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকজন তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করছিল। কিন্তু তিনি যখন গাজীপুরে নিকটস্থ থানায় পৌঁছলেন, তাকে নিয়ে যাবার মত পুলিশের কোন জায়গা ছিল না। তার ভাই প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরের জেলা বরিশাল থেকে এসে তাকে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ওই থানাতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানিয়েছে যে যেসব নারী এবং মেয়েরা পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ পুলিশের কাছে দায়ের করতে চেয়েছেন এমন নারী এবং কন্যা শিশুদের কাছে থেকে পুলিশ কর্মকর্তারা সাধারণ ডায়েরির অভিযোগ (পুলিশ রিপোর্ট) গ্রহণ করতে বা যে কোন সহযোগীতা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

জবাবদিহিতায় ব্যর্থতা

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার অপরাধীরা বাংলাদেশে খুব কমই অভিযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের দেওয়া তথ্য অনুসারে, নারী ও মেয়েদের জন্য সরকারের নয়টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের একটির মাধ্যমে আইনী মামলা দায়ের করা ১১,০০০ এরও বেশি নারীর মধ্যে কেবল ১৬০ জন সফলভাবে দণ্ডাদেশ পেয়েছেন। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও মেয়েদের যারা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন তারা সেই কথা কাউকে বলেন না, এটা নিরুৎসাহজনক যে যারা সাহায্য চাইতে— এবং অতিরিক্ত আইনি প্রতিকার খোঁজেন— সেক্ষেত্রে কেবল মাত্র ১ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা সফলভাবে আইনি প্রতিকার পাবেন।

জাস্টিস অডিট বাংলাদেশ (Justice Audit Bangladesh) কর্তৃক ৭১ টি থানা থেকে সংগৃহীত মামলার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং জার্মান উন্নয়ন সংস্থা জিআইজেডের (GIZ) মধ্যে একটি যৌথ প্রোগ্রামে মাধ্যমে, তদন্তাধীন নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রায় ১৬,০০০ মামলার মধ্যে, প্রায় ৩ শতাংশ দণ্ডাদেশ পর্যন্ত যেতে পারে, একই সময়কালে তদন্তাধীন অন্যান্য মামলার ৭.৫ শতাংশ দণ্ডিত হারের তুলনায়। যেখানে ৭.৫-এর দণ্ডের হারও কম, এটি দেখা যায় যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনি পথ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্ত বাংলাদেশী যে বাধার মুখোমুখি হয়েছিল তা নারী ও মেয়েদের জন্য ব্যাবস্থাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫ সালের একটি গবেষণায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীনে দায়ের করা মামলার স্বল্প সাফল্যের হার ব্যাখ্যা করতে চাইলে ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনটি

জেলার বিশেষ নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনালের মামলার রেকর্ড সংকলন করে দেখা গেছে যে দোষী সাব্যস্ত করার হার ধীরে ধীরে প্রায় ২ শতাংশ থেকে ০.৪২ শতাংশে নেমে এসেছে। জাস্টিস অডিট অনুসারে, ২০১৬ সালে আদালত সে বছর ১৭০,০০০ এরও বেশি চালু হওয়া নারী ও শিশু মামলার মাত্র ২০ শতাংশ নিষ্পত্তি করেছে, যা অভিযুক্তদের মাত্র ০.৫ শতাংশকে দোষী সাব্যস্ত করে।

এসিড সহিংসতার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইনে আপেক্ষিক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও, এসিড সহিংসতায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা একইভাবে কম দণ্ডাদেশ বিচারের মুখোমুখি হন। আসলে, এসিড সহিংসতার ঘটনা যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি বিচারের হারও কমেছে। ২০০২ সালে আইন পাস হওয়ার পর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পুলিশ সদর দফতরের এসিড ক্রাইম কেস মনিটরিং সেলের রেকর্ড করা প্রায় নয় শতাংশ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তবে এই সামগ্রিক পরিস্থিতি ২০০২ সালে এসিড আইনটি পাস হওয়ার পরে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে একটি অস্বাভাবিকভাবে ২০ শতাংশে ঊর্ধ্বগতি হয়েছে। তারপরের বছরগুলোতে এই হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে, সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের যে মামলাগুলির জন্য পুলিশ তথ্য প্রকাশ করেছে, সেগুলি বিবেচনা করলে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হারটি আসলে তিন শতাংশ। তারপর থেকে পুলিশ সেল মামলার ফলাফল রেকর্ড করা বন্ধ করে দেয়।

এই দণ্ডাদেশগুলি কেবলমাত্র সেই মামলাগুলির জন্য বিবেচিত হয়েছিল যেগুলি পুলিশ দায়ের করেছিল এবং এসিড ক্রাইম কেস মনিটরিং সেলকে রিপোর্ট করেছিল। বাস্তবে, কোনও বেঁচে থাকা ব্যক্তি তাদের আক্রমণকারীকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখবে এমন সম্ভাবনা আরও কম রয়েছে কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এটি কখনও বিচারের পর্যায়ে যায় না।

নিম্ন দণ্ডাদেশ হারের পাশাপাশি, নিচে বর্ণিত বিচার প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা গুরুতর উদ্বেগ এর বিষয়। এসিড সার্ভাইভরস ফাউন্ডেশনের (এএসএফ) তত্কালীন পরিচালক সেলিনা আহমেদ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছিলেন যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিচারের সুযোগ পাওয়া তার প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ ছিল।

বাংলাদেশে এসিড সহিংসতা

এএসএফের মতে গত ২০ বছরে বাংলাদেশে এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৩,৮০০ এরও বেশি, বেশিরভাগ আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে পুরুষদের দ্বারা এমন নারী বা মেয়েদের লক্ষ্য করে যারা তাদের পরিচিত। লিঙ্গ বৈষম্য, এবং পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে এসিড আক্রমণ প্রায়শই ঘটে চলেছে। যৌন বা বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, শিক্ষা বা কাজের সন্ধানের শাস্তি হিসাবে, কিংবা জমি বা যৌতুক প্রথায় বিরোধিতা করার এক ধরনের ফলাফল হিসাবে এসিড আক্রমণ হয়ে থাকে।

যখন কোনও ব্যক্তির উপর ঘন এসিড নিক্ষেপ করা হয় তখন তা তাৎক্ষনিকভাবে ত্বকের মধ্য দিয়ে গলে যায়, প্রায়শই চোখ, কান, নাক, ঠোঁট এবং ত্বক দ্রবীভূত হয়ে হাড়ের নীচে চলে যায়। প্রথম দিকে, ভুক্তভোগীরা সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে - বিশেষত বাংলাদেশের মতো জায়গায় যেখানে পোড়া আক্রান্তদের জন্য সহজ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাণুমুক্ত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। বেঁচে যাওয়া ব্যাক্তিদের চলাফেরা করার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে প্রায়শই অস্ত্রপাচার এর প্রয়োজন হয়। পোড়া ক্ষত নিরাময় হতে এক বছর সময় নিতে পারে এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা ব্যতীত ঘন ক্যালয়েডের (Keloid) দাগ পড়ে যেটি আজীবন শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং যা স্বাভাবিক চলাচলকে গুরুতরভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এমনকি সঠিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও - আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই — অন্ধত্ব, শ্রবণশক্তি হ্রাস এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা ছিল।

পোড়া চিকিৎসার জন্য বিদ্যমান সরকারি সুযোগসমূহ বোঝাস্বরূপ এবং মূলত রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক। এই কারনেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য এটি বহুলাংশেই দুষ্প্রাপ্য। এই প্রতিবেদনের জন্যে নেয়া বেঁচে যাওয়া সকলেই সাক্ষাৎকারে মারাত্মক যন্ত্রণা সহ্য করার কথা প্রকাশ করেছেন। পোড়া চিকিৎসার জন্য মেডিসিন্স সানস ফ্রন্টিয়ার্স (Medecins Sans Frontieres) ক্লিনিকালের নির্দেশনাগুলি মরফিন (Morphin) ব্যবহারের পরামর্শ দেয়। যদিও, মরফিন (Morphin) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লুএইচও) প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় থাকার পরেও ওরাল মরফিন (Oral Morphin) কেবলমাত্র ঢাকায় পাওয়া যায়। এটি ব্যয়বহুল এবং সরবরাহের সল্পতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর অর্থ এই যে বেঁচে যাওয়া অনেক ব্যাক্তিরা পর্যাপ্ত ওষুধ ছাড়া তীব্র ব্যথা সহ্য করে থাকেন যা কেবল মানসিক পীড়াকেই বাড়িয়ে তোলে।

এসিড সহিংসতা যে কতটা ভয়াবহ তা খুব কমই সরাসরি দেখতে পাওয়া যায়। বরং, ভুক্তভোগীরা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুর্ভোগ নিয়ে বেঁচে থাকে। ভুক্তভোগীরা প্রায়শই গুরুতর এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে থাকেন এবং অনবরত যত্নের জন্য পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভর করে থাকেন, কখনও বা তাদের সারা জীবনের জন্যে। এছাড়াও, কিছু নারী বলেছিলেন যে তাদেরকে আক্রমণ করার পরে তাদের পরিবার বা স্বামীরা তাদের পরিত্যগ করেছে। উদাহরণস্বরূপ,৩০ বছর বয়সী শাম্মি বলেছিলেন যে তার স্বামী তাকে আক্রমণ করার পরে তার আর কোথাও যাওয়ার ছিলনা এবং তার পরিবার থেকে কেউ তাকে নিয়ে যায়নি। অবশেষে তিনি তার বোনের বাড়িতে থাকতে গিয়েছিলেন যেখানে তারা তাকে একটি ঘরে থাকতে দেয়। তার ভাষায় সেটি ছিল একটি ছোট আলমারি। "আমি সেখানে একটি পশুর মতো পরিত্যক্ত ছিলাম," তিনি বলেছেন।

এসিড আক্রমণের ফলে শারীরিকভাবে অক্ষম একজন নারীর শারীরিক কাজ সম্পাদন করার দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে যা তিনি আগে করতে সক্ষম ছিলেন, যার ফলে আর্থিক স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে যায়। স্বামীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ২৮ বছর বয়সী রেজওয়ানা বলেছিলেন যে তিনি একটি গার্মেন্টস কারখানায় পার্ট টাইম (part-time) কাজ করতেন তবে এখন তিনি বলেছেন যে তার জীবনে কাজ করবার ক্ষমতা এই ক্যালয়েডের দাগের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়েছে, অসম্ভব না হলেও সেলাই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় গতি এবং দক্ষতা তৈরী তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেছিলেন এই কারণে তিনি আর কাজ করতে পারবেন না এবং এখন এখন তিনি তার ভাইয়ের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল এবং বাসা ভাড়া নেয়ার ক্ষমতা না থাকায় তাকে বস্তিতে চলে যেতে হয়েছে।

বাংলাদেশে এসিড আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরাও সাংস্কৃতিক কলঙ্কের মুখোমুখি হন যেটি প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের মতই তাদের বৈষম্যের সম্মুখীন হবার প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, শাম্মি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি আর কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না কারণ তিনি বলেছেন,"সামাজিকভাবে, লোকেরা আমাকে দেখে ভয় পায়।" ফরিদা (৩৫), যার স্বামী তার যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরে তাকে আক্রমণ করেছিলেন, বলছিলেন যে প্রথমে তার নিজের বাচ্চারা তাকে নিয়ে "আতঙ্কিত" ছিল এবং তিনি এবং তার সন্তানরা উভয়ই "সম্প্রদায়ের লোকদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন কেননা তারা বিশ্বাস করে তিনি অমঙ্গল বয়ে আনবেন।”

বেঁচে যাওয়া ব্যাক্তিরা প্রায় সবাই যাদের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কথা বলেছিলো তারা ব্যাপক-উদ্বেগ, হতাশা, আঘাতজনিত উত্তেজনা, মানসিক সঙ্কট এবং স্থায়ী ভয় সম্বলিত অনুভূতির কথা বর্ণনা করেন। সাদিয়াকে তার স্বামী যে ঘরে আক্রমণ করেছিল সে ঘরে ঘুমানোর সময় তার উদ্বেগের অনুভূতির বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন: "আমি অনুভব করি যে আমি আমার নিজের মৃত্যুশয্যাতে ঘুমাই," । সাহানা, যার স্বামী তাকে এসিড দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন এবং যিনি এখনও আর্থিকভাবে লড়াই করছেন, তিনি কখনও কখনও ট্রেন স্টেশনে ঘুমানোর সময় রেললাইন গুলিতে গড়িয়ে পড়ে ট্রেনের ধাক্কার কথা ভাবেন। "এগিয়ে চলে কি লাভ?" সে জিজ্ঞেস করেছিল। চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে এসিড হামলার পর

থেকে তিনি তার পরিবারের বোঝা হয়ে আছেন বলে মনে করেন সালমা, তিনি বলেন "আমি অপারেটিং টেবিলে মারা গেলে হয়তো আরও ভাল হত।" "মাঝে মাঝে আমি আল্লাহকে কেবল আমাকে উঠিয়ে নিতে বলি," তিনি বলছিলেন।

এই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি দীর্ঘায়িত এবং ব্যয়বহুল যার কারনে ন্যায় বিচার প্রক্রিয়া আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এভাবে ভুক্তভোগীরা পুনরায় মানসিক আঘাত পাওয়া, চিকিৎসা ব্যায়ের পুনরাবৃত্তি, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, কলঙ্ক, সহায়তার অভাব এবং কখনও কখনও তাদের মামলাটি উঠিয়ে নেওয়ার হুমকির মুখোমুখি হয়ে থাকে।

সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থতার কারনে, এএসএফ বেঁচে যাওয়া মানুষদের মৌলিক চাহিদা সরবরাহের সিংহভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এএসএফ বাংলাদেশে প্রায় দুই দশক ধরে বেঁচে যাওয়া হাজার হাজার এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনামূল্যে তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তা, মনো-সামাজিক সেবা এবং আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে – স্বল্প সম্পদশালী গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রীয় সুবিধার কারণে অন্য ধরণের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ভুক্তভুগীদের জন্য প্রায়শই সেবা সমূহ ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। তবে, এসিড আক্রমণের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়, এসিড সহিংসতার দিকে মনোনিবেশ হ্রাস পেয়েছে এবং দাতারা আগ্রহ হারাচ্ছেন, এএসএফ এর কাছে এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য এই মুহূর্তে খুবই নগণ্য পরিমাণ সামর্থ্য রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ

এসিড সংক্রান্ত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা এবং সুরক্ষার বিষয়টি যখন আসে, ন্যায় বিচার ব্যবস্থা নাটকীয়ভাবে কমে যায় এবং এসিড সহিংসতায় বেঁচে যাওয়া অনেকেই প্রায় একই বাধার মুখোমুখি হয় যা প্রায়শই নারীদের এবং মেয়েদেরকে মামলা দায়ের করতে বাধা প্রদান করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো স্থানীয় দুর্নীতি, আইনি ব্যবস্থায় লিঙ্গ পক্ষপাত এবং আইন প্রয়োগের অভাবের সাথে মিলিত হয়ে আইনিভাবে প্রতিকারকে অকার্যকর করে তোলে।

পুলিশ কখনো কখনো সরাসরি প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, অভিযোগপত্র, দাখিল করতে বা গুরুতর তদন্ত চালিয়ে যেতে প্রত্যাখ্যান করে, বিশেষত এমন দাবিতে যেগুলি পারিবারিক সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত বা যখন অপরাধীরা প্রভাবশালী হয়। পারিবারিক সহিংসতা এসিড আক্রমণ পর্যন্ত যাওয়ার পর আক্রমনের শিকার হওয়া নারী বা মেয়েরা প্রায়শই সেবা সমূহ পায়না এবং পুলিশকে ঘটনাগুলি রিপোর্ট করতে স্বস্তি বোধ করেনা কারণ তারা আশঙ্কা করেন যে পুলিশ তাদের মামলা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে না এবং তাদের স্বামী বা শশুরবাড়ির লোকেরা অপরাধটি রিপোর্ট করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে।

একটি দেশে মাত্র ২১ টি সরকার-পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র এবং আনুমানিক ১৫ টি এনজিও পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র থাকার কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারী ও মেয়েদের সুরক্ষা ও সহায়তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সুবিধার অভাব রয়েছে যেখানে ৮ কোটিরও বেশি নারী এবং ৬.৪ কোটিরও বেশি শিশু রয়েছে। এটি সম্পূর্ণভাবে অপর্যাপ্ত, এই বিবেচনা করে যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারীরা তাদের জীবনে কিছু সহিংসতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। সহজলভ্য ও স্বল্পমেয়াদী আশ্রয়কেন্দ্রগুলি কেবল কয়েক দিন পর্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি দেয় এবং বেশিরভাগ আশ্রয়কেন্দ্রগুলির কিছু নারীরা যেনো তাদের সাথে যোগাযোগ না করতে পারে সে বিষয়ে কঠোর নিয়ম রয়েছে। কারো কারো জন্য থাকার কিছু নিয়ম রয়েছে, যেমন আদালতের আদেশের প্রয়োজন হয় এবং এনজিওর আশ্রয়কেন্দ্রগুলির বেশিরভাগই কিছু নির্দিষ্ট সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যাক্তিদের জন্যে যেমন যৌন পাচার; অন্যরা শিশুদের রাখার অনুমতি দেয় না এবং বেশিরভাগই নির্দিষ্ট বয়সের পর ছেলে শিশুদের রাখার অনুমতি দেয় না।

এসিড সহিংসতা এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে ফৌজদারি তদন্ত ও মামলা-মোকদ্দমাগুলি বহুল পরিমাণে খালাস পাওয়ার বা বছরের পর বছর তদন্তের মধ্যেই রয়ে যাওয়ার অতিসাধারণ কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাব। এটি প্রায়শই পুলিশের ত্রুটিপূর্ণ কাজ এবং সরকারী প্রসিকিউটরদের (Prosecutor) সক্রিয়ভাবে মামলাটি চালিয়ে যেতে, তদন্তকারীদের সাথে সমন্বয় বা সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার ফলস্বরূপ। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ফৌজদারি মামলাগুলোতে দোষী সাব্যস্তের হার কম থাকার বিষয়ে ২০১৫ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায়, দুর্বল পুলিশি তদন্ত থেকে পাওয়া অপর্যাপ্ত প্রমাণকে সীমিত আকারে সাজা দেওয়ার হারের অন্যতম মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে বাংলাদেশের সকল রকম প্রধান আইনগুলির শর্ত রয়েছে যে মামলাগুলি সর্বোচ্চ ৬০ থেকে ১৮০ দিনের মামলা নিষ্পত্তি সময়কাল্ের মধ্যে সমাধান করা উচিত। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়শই এসব মামলা বছরের পর বছর চলতে থাকে।

এই প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মামলা চলাকালীন সময়ে, অপরাধীদের ভয় বা হুমকির সাথে সাথে ব্যয় বহন এবং মানসিক সংস্থানের চাপ, অভিযোগকারীদের আদালতের বাইরে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য চাপ তৈরী করতে পারে যেটি কিনা তারা যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে না। ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারগুলির জাস্টিস অডিট সার্ভের, (Justice Audit survey) মামলার কর্মীরা বলেছিলেন যে আদালতের মামলাগুলি সমাধান করতে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় বছরের মত সময় লাগে যেখানে কয়েক মাসের মধ্যে এসব মামলা অবৈধভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

আইনজীবিদের দ্বারা প্রায়শই উল্লেখকৃত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার (Criminal Justice System) অন্যতম সমস্যা হলো মামলাগুলো স্থগিত করার মাধ্যমে দীর্ঘায়িত করা, এবং প্রায়শই ভুক্তভুগীরা সহ সাক্ষীদের উপস্থিত না হওয়ার কারণে এমনটি ঘটে। তবে,সাক্ষী সুরক্ষা আইন (Witness Protection Law) বা নিরাপদ আশ্রয়ে নির্ভরযোগ্য প্রবেশাধিকার ছাড়াই, বিশেষত তাদের স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যের কাছে থেকে একটি বিচারে অংশ নেওয়া প্রায়শই আইনি আশ্রয়প্রার্থী নারী বা মেয়েদের পক্ষে বিপদজনক। উপরন্তু, পাবলিক প্রসিকিউটররা প্রায়শই ফৌজদারি আইনে যথাযথ প্রশিক্ষিত না এবং সাক্ষীদের সাথে যোগাযোগ করতে বা নিরাপদে আদালতে হাজির করার মাধ্যমগুলো নিশ্চিত করতে এবং তাদের বিষয়গুলো অবগত করতে ব্যর্থ হন।

আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা বারবার দোষীদের বা এমনকি তাদের পরিবারের কাছ থেকে তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য চাপে পড়তে থাকে এবং কেউ কেউ এমন বর্ণনা করে যে তারা তাদের জীবন নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্থ কারণ বাংলাদেশে এখনও কোনও ভুক্তভুগী বা সাক্ষী সুরক্ষা আইন নেই। উদাহরণস্বরূপ, তসলিমা, যিনি ২০১৮ সালের এপ্রিলে বিরোধের পর এক আত্মীয়ের দ্বারা এসিড আক্রান্ত হয়েছিলেন, তিনি তার পরিবারের সাথে ঢাকার বাইরে চলে এসেছেন, যখন থেকে তারা অপরাধীর পরিবারের হুমকির মুখোমুখি হয়ে আসছিলেন। তাসলিমার মতে, এমনকি অপরাধীর আইনজীবীও তাদের হুমকি দিয়ে বলেছিল যে অভিযুক্ত অপরাধীকে কারাগারে প্রেরণ করা হলে "আপনার পরিবারের কেউ বাঁচবে না।" জাস্টিস অডিট (Justice Audit) দ্বারা জরিপ করা প্রায় ৯০ শতাংশ আইনজীবী বলেছিলেন যে দুর্বল সাক্ষী এবং অপরাধের শিকার, বিশেষত মহিলা ও কিশোরীদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না।

শক্তিশালী দুষ্কৃতিকারী বা তাদের সহযোগীদের চাপ কেবল ভুক্তভুগীরাই নয় বরং আইনজীবি,পুলিশ এবং অন্যান্য সাক্ষীদের আইনি আশ্রয় নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা তৈরি করেছে। আইনজীবিদের মধ্যে জাস্টিস অডিট সমীক্ষায়, অর্ধশতাধিক পাবলিক প্রসিকিউটর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকরা বলেছিলেন যে

তারা তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিয়ে ভয়ে ছিলেন। সামগ্রিকভাবে, জরিপ করা ২৩৭ জন ম্যাজিস্ট্রেটের ৮০ শতাংশের বেশি বলেছিলেন যে কেবল ২০১৬ সালেই ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে কার্যকরভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

যাতায়াত খরচ এবং আইনি ফি ও ঘুষের চাহিদা সহ দীর্ঘকালীন আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট আর্থিক ও মানসিক চাপ বিশেষত ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিকারক। তদুপরি, নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনালগুলি (সহিংসতার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল) প্রধান শহরগুলিতে অবস্থান নিয়ে আছে এবং যাতে করে দেশের পল্লী অঞ্চলে নারী ও কন্যাশিশুদের, যেখানে বেশিরভাগ জনসংখ্যার মানুষ বসবাস করে থাকে, তাদের যাতায়াতের অতিরিক্ত এবং উল্লেখযোগ্য রকমের বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যাটি সেই ধরনের মহিলাদের ক্ষেত্রে আরও জটিল হয়ে পড়ে, যারা তাদের স্বামীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল এবং যে কিনা প্রথম থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে । বাংলাদেশ জাতীয় নারী আইনজীবী সমিতির (বিএনডাব্লুএলএ) একজন আইনজীবী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যত সময় যায় "ভুক্তভুগীদের পরিবারগুলি সামনে এগিয়ে যেতে পারে না, অপরাধীরা মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য ভুক্তভোগীদের হুমকি দিতে পারে, আর সময়ের সাথে প্রমাণ হারিয়ে যায়, সময়ের সাথে সাথে সাক্ষীরা হারিয়ে যায়। মূলত, যখন মামলাগুলি বিলম্বিত হয়, তখন ন্যায়বিচার পথ খুজে পায়না।"

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩৪ লাখ ফৌজদারি মামলা জমা পড়ে রয়েছে। কোনও কেন্দ্রীয় ট্র্যাকিং পদ্ধতি (Centralized Tracking System) ছাড়া লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মামলা সহ আইনী রেকর্ডগুলির প্রসেসিং এবং সুযোগ নিশ্চিত করার কোনও উপায় নেই। নারীপক্ষের একজন আইনজীবী যেমন বলেছিলেন, "মামলাটি যখন উচ্চ আদালতে যায় তখন তা হারিয়ে যায়। এমনকি আমাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই কোনও মামলার অবস্থা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। এটি যদি আমাদের পক্ষেই কঠিন হয় তবে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো কীভাবে তাদের মামলার অবস্থা জানবে?" স্বচ্ছতা এবং সংস্থার অভাব আইনি তথ্যের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক "ফি" ব্যবস্থা করে দেয়।

মেয়েদের ও নারীদের প্রতি সহিংসতার জন্য দায়ীদের প্রতিরোধ, তদন্ত, বিচার এবং শাস্তি প্রদান এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক আইন এবং নিজস্ব সংবিধান এবং দেশীয় আইনের অধীনে বাংলাদেশের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এই দায়িত্বকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত। এর উচিত গুরুতর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, যেমন বিস্তৃত শিক্ষা এবং সচেতনতা বাড়াতে ক্যাম্পেইন; এবং সহিংসতা থেকে মুক্তি বা সুস্থ হতে চাইছেন এমন নারী এবং কন্যাশিশুদের জন্য বিস্তৃত সেবা প্রদান করা। সরকারের উচিত, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা জুড়ে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির বিষয়টি বন্ধ করা, সরকারী কর্মকর্তারা যেনো তাদের দায়িত্ব পালন করে তা নিশ্চিত করা এবং যারা এটি করতে ব্যর্থ হয় তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা।

প্রধান সুপারিশসমূহ

- সম্মতি, যৌনতা এবং সম্পর্কের বিষয়ে বিদ্যালয়ে বিস্তারিত শিক্ষার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; মিডিয়া প্রচারণা, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০ এবং ডিভিপিপি আইন অনুসারে নারী ও মেয়েদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ক্যাম্পেইন।
- প্রতিটি জেলায় লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতায় বেঁচে যাওয়াদের জন্য সহজগম্য ও নিরাপদ আশ্রয় প্রদানসহ দেশজুড়ে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতায় বেঁচে যাওয়া ব্যাক্তিদের জন্য আদালতের নির্দেশ বা শিশুদের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছাড়াই সেবা ব্যবস্থার বৃদ্ধি করা।

- ফৌজদারি তদন্তের মানদণ্ডে, বিশেষত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং পুলিশকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সরবরাহ করা।
- সমস্ত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মামলার জন্য একটি অনলাইন কেন্দ্রীয় ফাইলিং পদ্ধতি (online centralized filing system) তৈরি করা এবং মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং প্রতিবেদনগুলি যেন সহজলভ্য এবং মামলায় সমস্ত পক্ষের কাছে যথাযথ ভাবে অবারিত থাকে তা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশী নারীর অধিকার সংস্থাগুলির সাথে পরামর্শ করে একটি কার্যকর ভুক্তভুগী এবং সাক্ষী সুরক্ষা আইন পাস এবং বাস্তবায়ন করা।

সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের কাছে:

- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের জন্য পরিষেবাগুলিতে উন্নত সুযোগ ব্যবস্থা করুন, যার মধ্যে রয়েছে সমস্ত ভুক্তভোগীদের জন্য সুযোগযোগ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং ভুক্তভোগীদের আর্থিক সহায়তা, আবাসন, আইনি সহায়তা, সহায়তা পরিষেবা, পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করা।
- যৌতুক এবং এসিড সহিংসতা সহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা যে অবৈধ এবং ভুক্তভোগীদের জন্য যে পর্যাপ্ত সেবা রয়েছে, এবং কিভাবে পরিষেবাগুলির সুযোগ পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকে যেন সচেতন হন তা নিশ্চিত করতে চলমান জনসচেতনতা প্রচারণা বাস্তবায়ন করুন।
- আরও নারী পুলিশ অফিসার, প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের নিয়োগ ও ধারণ করে রাখার জন্য কৌশলগুলির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করুন।
- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মামলা পরিচালনার বিষয়ে পুলিশ, প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করুন।
- যৌতুক দাবি সম্পর্কে ভুয়া অভিযোগকে অপরাধী করে ধারা ৬ অপসারণ করার জন্য যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ সংশোধন করুন অথবা কমপক্ষে এই ধরনের অভিযোগের জন্য পরিণতি কমিয়ে আনুন এবং ধারা ৪ সংশোধন করুন যেখানে যৌতুক প্রদান এবং গ্রহন উভয়কেই সমানভাবে অপরাধী করে, সেখানে কেবল যৌতুক গ্রহন কে অবৈধ করুন।
- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে সংশোধন করুন এবং কোন ব্যাতিক্রম ছাড়াই নারী এবং পুরুষদের বিয়ের জন্য সর্বনিম্ন ১৮ বছর বয়স নির্ধারণ করুন। যতক্ষণ না এটি করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেখানে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এ ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের "বিশেষ পরিস্থিতিতে" বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখানে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে নতুন বিধিমালা গ্রহন করুন। বাল্য বিবাহ এবং শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ পরামর্শে এই বিধিমালাগুলোর খসড়া করুন।
- ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য একটি আইনের খসড়া এবং প্রয়োগ করার জন্য বাংলাদেশি নারী অধিকার এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করুন। এই ব্যবস্থাগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষীদের স্থানান্তরকরণ এবং প্রকাশ না করা বা সাক্ষীর পরিচয় এবং অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার জন্য একটি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, এবং প্রামাণিক নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা অভিযুক্তের ন্যায্য বিচারের অধিকার বহাল রেখে সাক্ষীকে হেনস্থা, ভয় দেখানো বা জোর করা থেকে রক্ষা করে সাক্ষ্যগ্রহণের সুযোগ দেয়।

আইন মন্ত্রণালয়

- ২০০৮ এর বিধিমালার ৭(ক) ধারা এবং/ অথবা আইন সহায়তা সেবা আইন, ২০০০ অধীনে এসিড সহিংসতা সহ পারিবারিক সহিংসতার জন্য আইনি প্রতিকারের সন্ধানকারী নারী এবং মেয়েরা আইনি সহায়তা তহবিলগুলিতে সুযোগ পাবার জন্য সক্ষম হবেন কিনা তা নিশ্চিত করুন। এটি

করার জন্য, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, হটলাইনগুলি এবং জেলা আইনি সহায়তা কমিটি এবং আইনি সহায়তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়কে ত্বরান্বিত করুন।

- সিইডিএডব্লিউ কমিটির সাধারণ সুপারিশ ৩৩ অনুসারে বিচার ব্যবস্থা প্রফেশনালদের দ্বারা লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য মোকাবেলার কাজে একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করুন।
- সরকারী কৌঁসুলী/ প্রসিকিউটরদের কার্যক্রম ও সাক্ষাতের পদ্ধতি পুনর্গঠন করুন যেন তারা স্বতন্ত্রভাবে কাজে নিযুক্ত হন এবং তাদের সকল কার্যক্রমে পুরো সময় কাজ করেন এবং ফৌজদারি আইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেন প্রসিকিউটররা তাদের দায়িত্ব পালনে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সক্ষম হন।
- সকল লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মামলার জন্য একটি অনলাইন কেন্দ্রীয়/সেন্ট্রালাইজড ফাইলিং সিস্টেম তৈরি করুন, এবং মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য বিনামূল্যে সকল পক্ষের কাছে সহজবোধ্য করে তুলুন।
- অভিযোগকারী বা আসামীদের পক্ষে আইনি প্রতিনিধিত্ব বা অন্যান্য আইনি পরিষেবার বিনিময়ে ঘুষের বিনিময় করেন এমন সকল সরকারী আইনজীবী এবং অন্যান্য আইনি কর্মকর্তাকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসুন।
- যে সমস্ত আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা অবহেলা করেন, ঘুষের প্রয়োজন হয়, বা কোনও মামলা পুরোপুরি ও তাৎক্ষনিকভাবে তদন্ত করার জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন, তাদেরকে এসিড অপরাধ দমন আইনের অধীনে এবং দণ্ডবিধি (The Penal Code) আইনের অধীনে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসুন।
- নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশি নারীদের অধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় ফৌজদারি তদন্তের মানদণ্ড, লিঙ্গ সমতা এবং নারীর অধিকার উন্নয়নে সরকারী প্রসিকিউটর ও পুলিশকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সরবরাহ করুন।
- আদালত, সরকারী হাসপাতাল, থানা, কারাগার, ভিকটিম সহায়তা কেন্দ্র এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারগুলি প্রতিবন্ধী আইন ২০১৩-এর শর্তাবলী অনুযায়ী শারীরিকভাবে প্রবেশযোগ্য এবং দোভাষী বা সহায়তাকারী ব্যক্তির তথা উভয়ের জন্যই সুযোগ নিশ্চিত করুন। সাক্ষীরা যারা কানে শুনে না বা কথা বলতে পারে না এমন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রমাণ আইন ১৮৭২ দ্বারা বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রমাণ সরবরাহ করার সক্ষমতা নিশ্চিত করুন।
- প্রতিবন্ধী আইন- ২০১৩ এর শর্তাবলী অনুসারে সকল পুলিশ এবং আদালত কর্মকর্তাদের প্রতিবন্ধী অধিকার এবং অক্ষমতা সম্পর্কিত আবাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করুন।
- তদন্ত এবং দ্রুত বিচারের সময়সীমা কার্যকর হওয়া উচিত যেন আদালত তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে এটি পরিষ্কার করে বলে দেওয়া উচিত যে বেঁচে থাকা ব্যক্তির আইনি প্রতিকার পাওয়ার সীমাবদ্ধতায় এটি কোনও আইন নয়।
- সিইডিএডব্লিউ কমিটির সাধারণ সুপারিশ ৩৩ অনুসারে, কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় ভার্চুয়াল কোর্টের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করুন যেন অনলাইন কোর্ট শুনানির অধিবেশন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে অনলাইন পুলিশের প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা সহজতর করা যায়।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়

- ২০১৫-২০২১ সালের জন্য বাল্য বিবাহ নির্মূলের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন করুন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে নারী ও মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুবিধা প্রচার করুন।
- সিইডিএডব্লিউ কমিটির সাধারণ মন্তব্য ৩৩ -এর সুপারিশ অনুসারে, বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিরক্ষর নারীদের বোধগম্যতার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র আইনি সহায়তার বিধান নিশ্চিত করুন।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রয়োগের জন্য পদক্ষেপ নিন:
    - সংস্থান (resources), প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিকস (logistical) সহায়তা সরবরাহ করুন যাতে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা পারিবারিক সহিংসতার মামলাগুলি সংশ্লিষ্ট আদালতে এবং সংশ্লিষ্ট থানার দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে যথাযথভাবে উত্থাপনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন; ভুক্তভুগীদের আদালতে সুরক্ষা আদেশের জন্য আবেদন করার জন্য সহায়তা করেন এবং আইনি সহায়তা আইন ২০০০ এর অধীনে আইনি সুযোগ দিতে পারেন; এবং নিরাপদ আশ্রয়ে ভুক্তভুগীদের নির্দেশনা দিতে পারেন।
    - নারী ও মেয়েরা উভয়ই যেনো তাদের অস্তিত্ব, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং কীভাবে সেগুলির সুবিধা ভোগ করতে হয় তা জানতে পারে, সেই জন্যে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা যেন পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা করে থাকেন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
    - প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যাতে তারা জেলা পর্যায়ে সমবর্তী দায়িত্ব পালন করার সময় ডিভিপিপি আইন বাস্তবায়নের জন্য এককভাবে দায়িত্ব পালন না করেন।
    - লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া প্রতিটি জেলায় সুযোগ যোগ্য এবং নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র প্রদান করুন, এমন আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে নারীদের তাদের ছেলেসহ বাচ্চাদের সাথে থাকতে দেয়। ব্যাপকভাবে প্রচারণা ও তথ্য প্রচার পরিচালনা করুন যেন মেয়েরা এবং নারীরা আশ্রয়কেন্দ্রের খোঁজ এবং কীভাবে সেগুলিতে প্রবেশাধিকার পাবেন সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন। আর্থিক সহায়তা, আয়ের উৎস এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে অস্থায়ী জরুরী আবাসন থেকে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনগুলিতে নারীদের স্থানান্তর করতে সহায়তা করার ব্যবস্থা তৈরি করুন।

নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সংক্রান্ত বহুমাত্রিক কর্মসূচি

- সরকারী এবং এনজিও-এর আশ্রয়কেন্দ্র গুলিতে রেফারেল সেবা চালু করার জন্যে হটলাইন (hotline), ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস কেন্দ্র (One-Stop Crisis Centre) এবং জেলা পর্যায়ের সরকার এবং এনজিও এর মধ্যকার সমন্বয় আরো উন্নত করুন।
- আইনী সহায়তা সম্পর্কিত সেবা সমূহের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্যে হটলাইন, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস কেন্দ্র এবং জেলা পর্যারের আইনি সহায়তা প্রদানকারী কমিটির মধ্যকার সমন্বয় আরো উন্নত করুন।
- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস কেন্দ্রগুলো নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক আকারে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করুন।

- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস কেন্দ্র এবং পাবলিক হাসপাতালের জরুরি কক্ষগুলির মধ্যে সমন্বয় উন্নত করুন।
- ভুক্তভোগীদের সহায়তাকারী কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ এবং ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে আরও সংস্থানের ব্যবস্থা করুন।

জাতীয় এবং জেলা এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ তহবিল এবং জেলা আইনি সহায়তা কমিটি

- এসিডের সহজলভ্যতা নিয়ন্ত্রণ এবং ২০০৮ বিধি অনুসারে বর্ণিত বিধানগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রগতিগুলো অনুসরণ করার জন্য নিয়মিত দেখুন এবং বিশদ পরিকল্পনা এবং সময়সীমা এবং পরিমাপযোগ্য মধ্যস্থতাকারী মানদণ্ড স্থাপন করুন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
    - এসিড আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন সহ জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ তহবিলের প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য অনুসারে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ডিএসিসিগুলিকে(DACC) এনএসিএফ (NACF)-এর তহবিল বিতরণ করুন।[১]
    - এনএসিএফ (NACF) তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রকাশ করুন।[২]
    - নিশ্চিত করুন যে প্রত্যেক ডিএসিসি চেয়ারম্যান পৃথক পৃথক এসিড আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে জেলা ভিত্তিক আইনি সহায়তা কমিটির কাছ থেকে আইনি সহায়তার অনুরোধ করার জন্য ২০০৮ বিধিমালার ধারা ৭(ক) এর অধীনে তার দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩]

দাতা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী

- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ পরিষেবাগুলি বিস্তারে ভিক্টিম সহায়তা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ এবং সারা দেশে নারী ও শিশুদের আশ্রয়ের উপযোগীতা তৈরির জন্য সরকারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করুন।
- আরো বেশি নারী পুলিশ, প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের নিয়োগ ও ধারণ করতে সরকারকে সহায়তা করুন।
- ফৌজদারি আইন এবং পাবলিক প্রসিকিউটরদের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করুন।
- জাতীয় বিচারকের ঘাটতি পূরণে আরও বিচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষা মূলক কর্মসূচিকে সহায়তা করুন।
- পুলিশের তদন্ত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করুন।
- পুলিশ ও পাবলিক প্রসিকিউটরদের অপরাধ তদন্তের সমন্বয় করতে একত্রে প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা মূলক কর্মসূচী বিবেচনা করুন।

- সকল কেন্দ্রীয় আদালতের নথিগুলি একটি অনলাইন কেন্দ্রীয় আদালত ফাইলিং পদ্ধতিতে (filing system) স্থানান্তরের জন্য আর্থিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা করুন।
- বাংলাদেশকে সাক্ষী সুরক্ষা আইন পাস করার এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে একটি কার্যকরী সাক্ষী সুরক্ষা কর্মসূচী তৈরির জন্য অনুরোধ করুন।
- ডিভিপিপি (DVPP) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার পদে আর্থিক সহায়তা এবং সংস্থান সরবরাহ করুন।

[১]এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২, ধারা ১০, ১।
[২]আইবিআইডি., ধারা ১২, ১।
[৩]এসিড বিধি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মেডিকেল, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসন, ২০০৮, ধারা ৭(ক)।